Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

An in depth study of a song of Tagore: Amal dhabal pale legeche

অমল ধবল পালে লেগেছে : তন্নিষ্ঠ পাঠ

Goutam Kumar Nag
Dept of Foreign Languages, University of Burdwan, West Bengal, India

Abstract
The object of study of the present paper is a well known song of Tagore : *amal dhabal pale legechhe.* It should be noted that this study is confined only to the poetical framework of the song ; the musical aspect is excluded. Our objective is to demonstrate through an in depth analysis of the salient linguistic features of the song, how the underlying theme of the beauty of the autumn clouds has been developed at various levels of the text : phonetic, lexical, syntactic and semantic levels. We have tried to highlight the linguistic elements that distinguish it from other songs of Tagore, composed on the theme of autumn (*sharat*) .
Key Words : autumn (*sharat*), Tagore's songs, linguistic elements

Article

এই নিবন্ধটি প্রকৃতি পর্যায়ের শরৎ উপপর্যায়ের একটি সুপরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তরঙ্গ ও ভিন্নতর পাঠ : অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া। সাঙ্গীতিক রূপটি নয়, এই গানের কাব্যরূপটি আমাদের আলোচ্য। এই গানের কাব্য অবয়বের সৌন্দর্য আস্বাদনের উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন গঠক উপাদানের বিশ্লেষণ করব। আমরা গানটি পাঠ করব বিভিন্ন স্তরে : শব্দচয়ন, শব্দসমূহের পারস্পরিক অন্বয়, বাক্য ও কলির বিন্যাস, ধ্বনিগত গঠন, বিভিন্ন ব্যকরণগত উপাদানের ব্যবহার। একই সঙ্গে শরতের গানের মধ্যে আমরা আমাদের আলোচ্য গানটির স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করব। এই গানটি গীতবিতানে প্রকৃতি পর্যায়ের ১৪৫নং গান। "গীতাঞ্জলি" কাব্যগ্রন্থে এবং "শারদোৎসব" নাটকে এই গানটির পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। শেষোক্ত দুটি ক্ষেত্রে গানের শুরুতে "লেগেছে" (লেগেছে অমল ধবল পালে) এবং পংক্তিবিন্যাসও ভিন্ন। আমাদের আলোচনার জন্য আমরা গীতবিতানে প্রাপ্ত কাব্যরূপটি বেছে নিয়েছি।

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া---
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে কোন্ সুদূরের ধন---
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া।।
পিছনে ঝরিছে ঝরো ঝরো জল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার হাসিকান্নার ধন
ভেবে মরে মোর মন---
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র কী মন্ত্র হবে গাওয়া।।[১]

কলির সংখ্যার বিন্যাসে একটা চক্রাকার আবর্তন ধরা পড়ে। স্থায়ী ও সঞ্চারী এবং সমান্তরালভাবে অন্তরা ও আভোগ যথাক্রমে দুটি ও তিনটি কলিতে গঠিত। অর্থাৎ কলির সংখ্যার বিন্যাসে এই কাব্য অবয়বের গঠনকৌশল হল : দুই, তিন, দুই, তিন।

অন্তরা ও আভোগ অংশের সমান্তরালতার আর একটি রূপ পরিলক্ষিত হয় শব্দচয়নের স্তরে। তিন কলিবিশিষ্ট দুটি অংশেই প্রথম ও দ্বিতীয় কলির শেষে রয়েছে "ধন" এবং "মন"। এমন শব্দপ্রয়োগের তাৎপর্য দুটি স্তরে বিশ্লেষণযোগ্য : ধ্বনিস্তরে (phonetic level) এবং আর্থস্তরে (semantic level)।

ধ্বনিস্তরে দেখা যায় উক্ত দুটি শব্দের উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত : ধন্, মন্ --- অর্থাৎ এই চারটি কলিতে ব্যঞ্জনান্ত বা রুদ্ধদলের (closed syllable) অন্ত্যমিল। উল্লেখ্য এমন অন্ত্যমিল শুধু এই চারটি কলিতেই। বাকি সব কলিতেই অন্তস্থিত শব্দের উচ্চারণ স্বরান্ত --- অর্থাৎ অন্ত্যমিল স্বরান্ত বা মুক্তদলের (open syllable)। স্থায়ী, অন্তরা ও আভোগে এই মিল "আওয়া" ধ্বনিগুচ্ছে (হাওয়া / বাওয়া / পাওয়া / গাওয়া/) এবং সঞ্চারীর দুটি কলিতে এই মিল "আকে" ধ্বনিগুচ্ছে (ডাকে / ফাঁকে) । আমরা ব্যঞ্জনান্ত অন্ত্যমিলের তাৎপর্য গানের ভাববস্তুর আলোতে বিশ্লেষণ করব।

আর্থস্তরে "মন"এর ভূমিকা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। লক্ষণীয় উভয় ক্ষেত্রেই "মন"এর অবস্থান তিনটি কলির মধ্যে দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ অন্তরার অথবা আভোগের কেন্দ্রস্থলে। মন এই গানে নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে অথবা গানের বৃহত্তম অংশই মনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে --- "মন"এর এই কেন্দ্রীয় অবস্থানের মধ্যে তেমন কোন ইঙ্গিত নিহিত আছে ? গানের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা এই সমস্ত প্রশ্নের নিরসন করার চেষ্টা করব। সেইসঙ্গে এই আলোচনায় স্থান পাবে উল্লিখিত "ধন"এর তাৎপর্য, "মন"এর সঙ্গে তার সম্বন্ধ, অন্তরা এবং আভোগ অংশে "মন"এর ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা।

গানের কথাবস্তুর প্রাথমিক পর্যালোচনায় দেখা যায় এর দৃশ্যপটের বৃহত্তম অংশ জুড়ে রয়েছে তরণীর অনুষঙ্গ। স্থায়ীতে তরী বেয়ে চলার নয়নাভিরাম দৃশ্য, অন্তরায় চিত্রিত তার যাত্রাপথ, আভোগ অংশে চালকের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস। একমাত্র সঞ্চারীতেই তরণীর কোন অনুষঙ্গ নেই, গানের এই এক তৃতীয়াংশ জুড়ে শুধুই আছে নৈসর্গিক পটভূমি।

প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে এই গানে তরণীর রূপকল্পটি কোন বাস্তব দৃশ্যের চিত্রায়ণ নয়, এটি একটি রূপক। উপমেয় শরতের নীল আকাশে ভাসমান শুভ্র মেঘমালা। শরৎমেঘের বর্ণনায় জলযান বা স্থলযানের উপমানের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আমরা শরতের আরও দুটি গানে পাই। জলযানের উদাহরণ :

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই লুকোচুরি খেলা ---
নীল আকাশে কে ভাসালে **সাদা মেঘের ভেলা** রে ভাই --- লুকোচুরি খেলা ।। [২]

স্থলযানের উদাহরণ :

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা বেঁধেছি শেফালিমালা---
.....
এস গো শারদলক্ষ্মী, তোমার **শুভ্র মেঘের রথে,** [৩]

উক্ত গানদুটিতে উপমেয় "মেঘ" উপস্থিত এবং সম্বন্ধপদের রূপের প্রয়োগের মাধ্যমে উপমানের (ভেলা / রথ) সঙ্গে তার সম্বন্ধ সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। উপমেয় বা উপমানের জন্য নির্দিষ্ট শুধুমাত্র একটি কলি :

দুইয়ের অবস্থান একই কলিতে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গানে শুধুই উপমান তরণীর উপস্থিতি তার বিস্তার গানের বৃহত্তর অংশ জুড়ে --- উপমেয় মেঘ সম্পূর্ণভাবে অন্তরালেই রয়ে গেছে। সঞ্চারী অংশে বর্ণিত মেঘ শরতের জলহারা মেঘ নয়, এই মেঘ শরতের দিনে বর্ষার স্মৃতিবাহী জলভরা কাজল মেঘ। এ শুধু শরৎরবির কনককিরণের সঙ্গে মিলেমিশে পটভূমি রচনা করে। এই মেঘ তরণীর উপমান নয়।

এই তরণী যে শরৎমেঘের প্রতীক --- তার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত গানের কথাবস্তুতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। গানে কোথাও "শরৎ" "শারদ" বা সমতুল কোন শব্দের প্রয়োগ নেই। শিউলি, কাশ, শিশিরসিক্ত তৃণদল প্রভৃতি শরতের পরিচিত রূপকল্পগুলিও এই গানে অনুপস্থিত। সঞ্চারী অংশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা রয়েছে--- একমাত্র একেই শরতের রূপকল্প বলে গণ্য করা যেতে পারে। বস্তুতঃ শুধুমাত্র সপ্তম কলির ভিত্তিতেই এই গানটিকে শরতের গান বলে অভিহিত করা যায়। অবশ্য এই যুক্তিও সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র নয়, কেননা বর্ষার গানেও আলো-আঁধারের সহাবস্থানের এমন চিত্রকল্প চোখে পড়ে।

আজি বর্ষারাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয় অরুণ আলো মেশে।।[৪]

অতএব তরণীকে শরৎমেঘের উপমানরূপে চিহ্নিতকরণের ভিত্তি শুধু মাত্র গীতবিতানে এই গানের শ্রেণিবিন্যাস এবং "শারদোৎসব" নাটকে এই গানের প্রয়োগ। এই গানের প্রচলিত ব্যাখ্যাটিই একমাত্র পাঠ নয়। সমস্ত তথ্য পরিহার করে যদি শুধুমাত্র গানটির কথাবস্তু অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়া যায় তবে গানটি একটি তরণীযাত্রার গানরূপে প্রতীয়মান হবে। ভিন্ন ভিন্ন পাঠক এই তরণীর এবং তার যাত্রার ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তীর বিশ্লেষণটি উল্লেখ করা যেতে পারে। অধ্যাপক চক্রবর্তী অস্তিবাদের আলোকে গানটি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

> ১২ সংখ্যক কবিতায় ('লেগেছে অমল ধবলপালে') আবার সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা ফিরে এসেছে। এটি যে কেবলমাত্র জলযাত্রা নয়, রূপক, তা বোঝাবার জন্যই বলেছেন, 'দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া'। কিনারায় সব ফেলে রেখে অকূল সুদূরে 'ভেসে যেতে চায় মন।' অসীম মুক্তিই অস্তিত্ব বা চৈতন্যের স্বরূপ। অবিদ্যা (bad faith) পিছুটান টানে ('পিছনে ঝরিছে ঝরো ঝরো জল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে'), কিন্তু মেঘের ফাঁক দিয়ে 'অরুণ কিরণ' অর্থাৎ অস্তিত্বের জ্ঞান এসে উপস্থিত হয়। কবি কাণ্ডারী বলে যাকে সম্বোধন করছেন সে কিন্তু অস্পষ্ট সত্তা। এই যাত্রা মনোযাত্রা ('ভেসে যেতে চায় মন') মনই মাঝি, মনই আসল কাণ্ডারী, চেতনাই শেষ নিয়ামক।[৫]

আমরা এই গানটিকে কোন দার্শনিক তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণে করব না। এর তাত্ত্বিক রূপটি নয়, এর সৌন্দর্যমগ্নতাই আমাদের সবচেয়ে আকর্ষণ করে। তবে অবশ্যই এটি শুধুমাত্র একটি বর্ণনামূলক রচনা নয়। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিসর্গশোভার চিত্রায়ণ এই গানের লক্ষ্য নয়। এই চিত্রায়ণের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই গভীরতর সঙ্কেত নিহিত আছে। আমরা সেই আলোচনায় আসব।

দূর নীলিমায় সঞ্চরমান নবনীতশুভ্র মেঘের দল --- শরতের এই অতিপরিচিত দৃশ্যটি কোন বিশেষ মুহূর্তে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিতে নিসর্গসৌন্দর্যপিয়াসী কবিচিত্তকে উদ্বেল করে তোলে। বর্তমান মুহূর্তের এই দেখা শুধু অতীতের দেখার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে না, অন্তর্নেত্রে উদ্ভাসিত সেই চলার দৃশ্য পূর্বে দেখা সমস্ত সমতুল দৃশ্যকে ম্লান করে দেয়। মুগ্ধপ্রাণের আবেশবিহ্বলতার প্রতিফলন "দেখি নাই" শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিতে। এই দুটি কলিতে তরণীর রূপটি ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয়েছে। শুরুতে দৃশ্যমান শুধুমাত্র অমল ধবল পালটুকু, কলির

শেষার্ধে দেখা যায় পালটি মৃদু পবনে কম্পমান। সমগ্র তরণীটি দৃষ্টিগোচর হয় এই অংশের শেষে --- "এমন তরণী বাওয়া" শব্দগুচ্ছের প্রয়োগে।

পালের বর্ণনায় ব্যবহৃত বিশেষণদুটির তাৎপর্য বিশ্লেষণযোগ্য। "ধবল" বিশেষণটি বর্ণনামূলক। কিন্তু "অমল" বিশেষণটির যোগে এই পাল এক অসামান্য নান্দনিকতায় মণ্ডিত হয়ে ; নৌকার পালের বর্ণনায় এমন বিশেষণের ব্যবহার অপ্রত্যাশিত। এই শুভ্রতা শুধু দৃষ্টিনন্দন নয়, সে এক শুচিস্নিগ্ধ আবেশে হৃদয় পূর্ণ করে দেয়।

এই দেখা শুধুমাত্র চোখের দেখা নয়, বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতে যা প্রতিভাত হয় এই গানে তা অদেখাই থেকে যায়; সেই ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে যায় এক নূতনতর, গভীরতর দেখা --- মনের দেখা।"মন" শব্দটি স্থায়ীতে অনুপস্থিত থাকলেও মনের ভূমিকাই এক্ষেত্রে প্রধান। এখানে মনই প্রকৃত দ্রষ্টা; সেই এই তরণীর অনুপম আলেখ্যের রচয়িতা।

এই তরণী স্থায়ীর সঙ্গে অন্তরার যোগসূত্র রচনা করে। অন্তরার প্রথম কলির ক্রিয়া "আনা"র কর্তা তরণী --- অবশ্য এই বাক্যে সে উহ্য থেকে যায়। চিত্রপট জুড়ে থাকে শুধু তার যাত্রাপথ। সেই যাত্রাপথের বা গন্তব্যস্থলের কোনও ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কলিতে আমরা দেখি প্রশ্নবোধক "কোন্" শব্দের পুনরাবৃত্তি --- "কোন্ সাগর" "কোন্ সুদূর" । এই সাগরের মত সাগরপারের সেই রাজ্যও নামহীন থেকে যায়। এই সাগর এক স্বপ্নপারাবার --- যেপথ বেয়ে এই মায়াতরণী সুদূরপারের ধন আহরণ করে আনে। সাগরপারের সেই দেশ এক চিরদূরায়মান অবাস্তব মনোহর কল্পলোক। দীর্ঘ অজানা পথ পাড়ি দিয়ে সেই স্বপনতরী যে ঐশর্য বহন করে আনে, বলা বাহুল্য তা কোন পার্থিব সম্পদ নয়, এই ধন দৈনন্দিন বাস্তবতা থেকে মুক্তির প্রতীক। সেই ঐশ্বর্যের কাছে প্রাত্যহিক বাস্তবের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত বৈষয়িক প্রাপ্তি মিথ্যা হয়ে যায়। সেই ধনে ধনী মন এইপারের সর্বস্ব পরিত্যাগ করে সুদূর অজানা লোকের অভিসারে ধাবিত হয়।

আমাদের বিচার্য ছিল অন্তরার কেন্দ্রস্থলে "মন" শব্দের অবস্থিতি। বস্তুতঃ এই অংশের প্রাণকেন্দ্রে "মন"; "মন"ই নিয়ামক, মনের ভূমিকাই প্রধান --- যেমন বাক্যগঠনের স্তরে তেমনি আর্থস্তরে। কেন্দ্রস্থিত দ্বিতীয় বাক্যের কর্তা "মন"। অন্তরাতে শুধুমাত্র এই কলিতেই বাক্যের কর্তা উপস্থিত। এর পূর্ববর্তী কলির মত পরবর্তী কলিতেও কর্তা উহ্য রয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত কলিতেও ক্রিয়ার অনুক্ত কর্তা এই "মন"। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলিতে অর্থাৎ অন্তরার দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে ব্যক্ত হয়েছে মনেরই আকাঙ্ক্ষা : "ভেসে যেতে চায়" / "ফেলে যেতে চায়"। প্রথম কলিতে বাক্যগঠনের পর্যায়েই কেবল মনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি নেই। কিন্তু আর্থস্তরে "মন" তার ভূমিকা পালন করছে --- পূর্ববর্তী অংশের তরণীর রূপকল্পের মত তার স্বপ্নের যাত্রাপথের নির্মাতাও এই মন।

অন্তরার শুরু ও শেষের বাক্যে কর্তার অনুপস্থিতি পর্যালোচনাযোগ্য। সাগরপারের অমেয় বৈভব মানসনেত্রকে এমন করে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে সেই ঐশ্বর্যবহনকারী তরী অন্তরালে চলে যায়। অপরদিকে এইপারকে ঘিরে জেগে থাকে বৈরাগ্যবিধুর অনুভূতি --- সেই অনুভূতির গভীরতায় তার উৎস মন আড়ালে থেকে যায়। তাই উক্ত কলিদুটিতে ক্রিয়ার কর্তা যথাক্রমে তরী ও মন উহ্য রয়ে যায়। অন্যভাবে বললে ক্রিয়াসম্পাদনকারী প্রচ্ছন্ন থাকে; প্রধান হয়ে ওঠে ক্রিয়াসম্পাদনের স্থান অথবা স্থানকে ঘিরে সঞ্চারিত অনুভূতি। এই দুই কলির একত্র পাঠে মূর্ত হয়ে ওঠে এপার ও ওপারের বৈপরীত্য, চিরপরিচিত বাস্তব ও স্বপ্নজগতের দ্বন্দ্ব।

স্থায়ী অংশ জুড়ে ছিল শুধুই তরী, অন্তরায় যুক্ত হল মন। গভীরতর পাঠে দুইয়ের মধ্যে নিবিড়তর সম্পর্ক ধরা পড়ে। আমরা দেখলাম অন্তরায় তরী ও মন একই ভূমিকা পালন করছে --- যথাক্রমে শুরু ও শেষের বাক্যে এরা অনুক্ত কর্তা। মধ্যবর্তী দ্বিতীয় কলিতে যেখানে বাক্যের কর্তা "মন" উপস্থিত সেখানে তার সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্বন্ধটি তাৎপর্যপূর্ণ। মনের আকাঙ্ক্ষা ভেসে যাওয়ার --- "ভেসে যাওয়া" ক্রিয়ার কর্তার স্থানে মনের চেয়ে তরীর প্রয়োগই অধিকতর প্রত্যাশিত । অন্যভাবে বললে মনের আকাঙ্ক্ষা যেন জলযানে রূপান্তরিত হওয়া। অন্তরায় মন ও তরীর এই একাত্মতায় প্রশ্ন জাগে এই তরী কি তবে শৈশবে রূপকথার কাহিনিতে শ্রুত মনপবনের নাও --- যা নিমেষে শতসহস্র যোজন পথ পাড়ি দেয় ? রবীন্দ্রনাথের ঋতুভাবনায় আমরা দেখি শরতের সঙ্গে রূপকথার অনুষঙ্গ :

শরৎ এনেছে অপরূপ রূপকথা
নিত্যকালের বালকবীরের মানসে।
নবীন রক্তে জাগায় চঞ্চলতা,
বলে চলো চলো, অশ্ব তোমার আনো'সে।[৬]

কিন্তু শরৎকে ঘিরে রূপকথার কোন অনুষঙ্গ আমরা শরতের গানে দেখি না।[৭] আমাদের আলোচ্য গানে রূপকথার অনুষঙ্গ তো নেইই , এমনকী শৈশবের কোন অনুষঙ্গ নেই। এই গানে আনন্দোচ্ছল, প্রাণচঞ্চল বালকদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, সাংসারিক সব চাওয়া পাওয়ার প্রতি যে অনাসক্তি এই গানে অভিব্যক্ত হয়েছে তা পরিণত মনেরই অনুভূতি। তবু এই তরী হয়তো বা বাস্তব সংসারের দ্বন্দ্ব সংঘাতে দীর্ণ হৃদয়ের উপর শৈশবস্মৃতির ছায়াসম্পাত; শরতের নীলাকাশে শুভ্র মেঘের আনাগোনা হয়তো মনের গভীরে সঞ্চিত সেই মনপবনের নাওয়ের স্মৃতিকেই জাগিয়ে তোলে --- তরণীর রূপকল্পে যেন তারই চকিত আভাস।

এই গানের একটি অভিনবত্ব সাগরের রূপকল্পের প্রয়োগে। রবীন্দ্রভাবনায় শরতের সঙ্গে সাগরের অনুষঙ্গ অলভ্য নয়। পূর্বোল্লিখিত কবিতাটিতে আমরা তার দৃষ্টান্ত দেখি :

ওরে শারদার জয়মন্ত্রের গুণে
বীর-গৌরবে পার হতে হবে **সাগরে।**
ইন্দ্রের শর ভরে নিতে হবে তূণে
রাক্ষসপুরী জিনে নিতে হবে জাগো রে।[৮]

কিন্তু শরতের এমন রূপকল্পনার প্রতিফলন আমরা শরতের গানে দেখি না। আমাদের আলোচ্য গানটি বাদ দিলে শরৎ উপপর্যায়ের তিরিশটি গানের মধ্যে আর একটিমাত্র গানে "সাগর" শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে।

তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে।
.....
জানি গো আজ হাহারবে তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল অশ্রু-**সাগর**-কূলে।[৯]

এই গানে সাগর থাকলেও সাগরযাত্রা নেই। এই সাগর পাড়ি দেওয়া যায় না, এই সাগর কোন যাত্রাপথ নয়, এই সাগর রূপক মাত্র। শরৎ উপপর্যায়ের গানের মধ্যে আমাদের আলোচ্য গানেই শুধুমাত্র সাগরযাত্রা আছে। শরতের লীলাস্থল সাধারণভাবে কুঞ্জকানন (শিউলিবন, কাশবন), ধানের ক্ষেত, নদীতীর। মেঘভারাক্রান্ত আকাশে শরৎরবিকিরণের প্রথম প্রকাশে আনন্দে আত্মহারা বালকের দল স্থির করতে পারে না তারা নাম না জানা কোন

বনে যাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় তাদের ক্রীড়াস্থল চাঁপাবন , তালদিঘির তীর। রৌদ্রছায়ার খেলায় মুগ্ধ বালকের দল ঘোষণা করে :

যাব না আজ ঘরে রে ভাই যাব না আজ ঘরে [১০]

কিন্তু এই গানেও দেখা যায় তাদের অবকাশ যাপনের ক্ষেত্র নদীতীর যেখানে চখাচখির মেলা। রবীন্দ্রভাবনায় শরৎ ছুটির ঋতু, রবীন্দ্রসাহিত্যে সে প্রাত্যহিক বাস্তবতা থেকে মুক্তির বার্তা বহন করে আনে

শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-ভোলানো সুরে--- [১১]

কিন্তু এই ঘর-ছাড়ানো ডাক ঘরের চার দেওয়ালের বন্ধন থেকে মুক্তির ডাক, কখনই দেশান্তরে পাড়ি দেওয়ার আহ্বান নয়। শরতের গানে শরৎঋতু সাগরপারের বাণী বহন করে আনে না। আমাদের আলোচ্য গানটির স্বাতন্ত্র্য এইখানেই।

আমরা অন্তরার প্রথম দুটি কলির ব্যঞ্জনান্ত বা রুদ্ধদলের অন্ত্যমিলের বিষয়টি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সমগ্র গানটিতে স্বরান্ত বা মুক্তদলের মিল এক বিস্তৃত পরিসর নির্মাণের সহায়ক --- এমন অন্ত্যমিলকে তরণীর যাত্রাপথের অসীম বিস্তারের ব্যঞ্জনাবাহীরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। পক্ষান্তরে রুদ্ধদলের অন্ত্যমিল একটি সসীম পরিধি রচনা করে। অভিযাত্রী মনের যাত্রা অন্তহীন নয়, লক্ষ্যবিহীন নয়, তার নির্দিষ্ট একটি অভিমুখ আছে। সুদূরপারের সেই ধন আহরণের আকাঙ্ক্ষাতে যাত্রাপথের শুরু, সেই ধনের প্রাপ্তিতে তার অবসান। রুদ্ধদলের অন্ত্যমিলের মধ্য দিয়ে আদি অন্ত-যুক্ত একটি পরিধির রূপ আভাসিত হয়। আভোগ অংশে মনের ভূমিকা যদি ভিন্ন হয়, ধনের যদি অন্য কোন তাৎপর্য থাকে তবুও ধ্বনিগত স্তরে অন্ত্যমিলের একই ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

এই গানের সঞ্চারী অংশটি বাকি অংশ থেকে স্বতন্ত্র --- গানের প্রাথমিক পর্যালোচনাতেই আমরা সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি। কিন্তু প্রাথমিক পাঠেই যা ধরে পড়ে --- তরণী বা তার কোন অনুষঙ্গের অনুপস্থিতিই সেই স্বাতন্ত্র্যের একমাত্র সূচক নয়। তার আর একটি রূপ ধরা পড়ে এই অংশে মনের ভূমিকায়। স্থায়ীর মত সঞ্চারীতেও "মন" শব্দটি অনুপস্থিত --- কিন্তু আমরা দেখেছি পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে মনই প্রধান নিয়ামক, প্রকৃত দ্রষ্টা সেখানে মন। কিন্তু সঞ্চারীতে "মন" শব্দটিই শুধু অনুপস্থিত নয়, মনের এখানে কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই। দ্রষ্টা এখানে নয়ন। তাই শেষ কলিতে দেখি অরুণকিরণ এসে পড়ে "মুখে"। শরৎরবির প্রথম কিরণের স্পর্শটুকু সম্পূর্ণভাবেই শরীরী হয়ে ওঠে। চলমান তরণীর দৃশ্যকল্পটি মুহূর্তের জন্য অন্তর্হিত হয়ে যায়, অন্তরালে চলে যায় মনোজগৎ --- দৃশ্যপট জুড়ে থাকে শুধুই বহির্জগৎ, শারদপ্রকৃতির পটভূমি। এই অংশে উপস্থাপিত চিত্রকল্পগুলি ইন্দ্রিয়চেতনায় প্রতিভাত বহির্জগতের প্রতিরূপ --- নিসর্গলোকের বহিরঙ্গ রূপের নিরাবেগ বর্ণনা।

প্রথম কলিতে প্রতীয়মান হয় বিদায়ী বর্ষার রূপ --- অবিরল ধারাবর্ষণ, মেঘগর্জন --- যা শরতের গানে নিতান্ত বিরল। ঝড়ের মেঘের আবহ রয়েছে শরতের এই গানটিতে :

তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে ।
জানি না কি মরণ নাচে, নাচে গো ওই চরণমূলে।।
শরৎ-আলোর আঁচল টুটে কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ **এলোচুলে।** [১২]

আর একটি গানে আমরা দেখি শরতের রঙ্গভূমিতে বর্ষার আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত প্রবেশ। এই গানে আছে মেঘের ঘনঘোর, ছায়াবিস্তার, বাদলবাতাসের আন্দোলন :

কোন্ খেপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙিনায়।
দুলিয়ে জটা ঘনঘটা পাগল হাওয়ার গান সে গায়।।
মাঠে মাঠে পুলক লাগে ছায়ারাগের নৃত্যরাগে।
শরৎরবির সোনার আলো উদাস হয়ে মিলিয়ে যায়।।
কী কথা সে বলতে এল ভরা ক্ষেতের কানে কানে
লুটিয়ে-পড়া কিসের কাঁদন উঠেছে আজ নবীন ধানে।
মেঘে অধীর আকাশ কেন ডানা –মেলা গরুড় যেন---
পথ-ভোলা এক পথিক এসে পথের বেদন আনল ধরায়।। [১৩]

এই গানে বিশেষতঃ স্থায়ী ও অন্তরাতে ঝোড়ো বাতাসের আন্দোলন, সেইসঙ্গে কাজলমেঘের ছায়াবিস্তারের রূপকল্পগুলিরই প্রাধান্য। অকালবর্ষণের সুস্পষ্ট চিত্র এই গানে নেই। সঞ্চারীর দ্বিতীয় কলিতে লুটিয়ে পড়া কাঁদনকে রূপকের মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের দৃশ্যের চিত্রায়ণরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কিন্তু এটি একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা মাত্র। শরতের দিনে অবিরাম বর্ষণের ইন্দ্রিয়গ্রাহী চিত্রকল্প শুধুমাত্র আমাদের আলোচ্য এই গানটিতেই আছে।

সমগ্র গানটিতে এই কলির স্বাতন্ত্র্যের আর একটি দিক ধরা পড়ে এর ধ্বনিগত গঠনে। এই গানে শুধু এই কলিতেই ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। "ঝরো ঝরো" ও "গুরু গুরু" ধ্বন্যাত্মক শব্দযুগলের মধ্য দিয়ে বৃষ্টিপাত ও মেঘগর্জন ধ্বনিত হয়ে ওঠে : সেই ধ্বনি গভীরতর হয়ে ওঠে ওই ধ্বন্যাত্মক শব্দেগুলির সঙ্গে প্রথমার্ধে 'ছ' 'জ' 'ঝ' ও 'র' ধ্বনির ব্যবহারে এবং দ্বিতীয়ার্ধে 'দ' 'ড' ধ্বনির ব্যবহারে। উল্লেখ্য শরতের গানে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার নিতান্ত বিরল। এই গানটি বাদ দিলে শরতের আর একটিমাত্র গানেই এই প্রয়োগ দেখা যায়; ইতিপূর্বেই একাধিকবার উল্লিখিত সেই গানটি হল :

তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে।
.....
জানি গো আজ **হাহা**রবে তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল অশ্রু-সাগর-কূলে। [১৪]

তবে উল্লেখ্য "হাহা" শব্দটি বাস্তব ধ্বনির অনুকারজাত নয়, এই ধ্বন্যাত্মক শব্দটি সম্পূর্ণভাবে অনুভূতিদ্যোতক। শ্রবণেন্দ্রিয়ে শ্রুত ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্ট ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার শুধুমাত্র আমাদের আলোচ্য গানেই পাওয়া যায়।

আভোগে "মন" ও "ধন" শব্দযুগলের প্রত্যাবর্তন এবং প্রতিসম অবস্থান। গানের যে দুটি বাক্যে মনের উপস্থিতি তাদের অবস্থানগত প্রতিসাম্য প্রাথমিক পাঠেই ধরা পড়ে --- দুটি বাক্যেরই অবস্থান যথাক্রমে অন্তরা ও আভোগের কেন্দ্রস্থলে। এছাড়া উক্ত বাক্যদুটির নির্মাণকৌশলও এক : বাক্যের শুরুতে ক্রিয়াপদগুচ্ছ, শেষে কর্তা "মন"।

ভেসে যেতে চায় মন
.....
ভেবে মরে মোর মন

সমান্তরাল অবস্থানে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটি ক্রিয়ার প্রয়োগে একই মনের দ্বৈতরূপ উন্মোচিত হয়। প্রথমে আমরা প্রত্যক্ষ করি তার গতিময় রূপ (ভেসে যাওয়া), শেষে তার ভাবনিমগ্ন রূপ (ভেবে মরা)।

মনের এই যুগলরূপের তুলনামূলক আলোচনায় আর একটি গানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে--- যে গানে মন ও মেঘের মধ্যে নিবিড় সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। সঞ্চরমান মেঘের পটভূমিতে মনের ভেসে যাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা আমাদের আলোচ্য গানে প্রকাশিত, তাকে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষাতে এইভাবেও ব্যক্ত করা যেতে পারে :

মন মোর মেঘের সঙ্গী [১৫]

পার্থক্য এই যে আমাদের আলোচ্য গানে মন বর্ষামেঘের পরিবর্তে শরৎমেঘের সঙ্গী । বর্ষামেঘের সঙ্গী মনের উদ্দাম ধাবমান রূপটিই কেবল দৃষ্টিগোচর হয়। মন শুধুই উড়ে যায়, ধেয়ে চলে ; উক্ত বর্ষাসঙ্গীতটিতে "মন" যেখানে কর্তা সেখানে ক্রিয়াপদ হল "উড়ে চলে" "উড়ে যায়" ধায়"। কিন্তু শরৎমেঘের সঙ্গী মনের গতিময় রূপটি দেখা যায় শুধুমাত্র অন্তরাতেই। তবে উল্লেখ্য এক্ষেত্রে "যাওয়া" ক্রিয়াটির অসমাপিকা রূপটি ব্যবহৃত হয়েছে, সমাপিকা ক্রিয়া হল "চাওয়া"। অর্থাৎ এই গতিময়তা (ভেসে যাওয়া) শুধুমাত্র মনের বাসনাতেই। তারপর সেই গতিময়তার লেশটুকুও গানের শেষে অন্তর্হিত হয়ে যায় ; তখন শরৎমেঘের সঙ্গী মনের ভাবব্যাকুলতাটুকুই সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়।

মনের নিয়ন্ত্রক ভূমিকাটি সবচেয়ে স্পষ্ট এই আভোগ অংশেই --- বাক্যের গঠন কৌশলেও তারই প্রতিফলন। অন্তরার তিনটি কলি তিনটি স্বতন্ত্র বাক্য --- তার মধ্যে দুটি বাক্যের কর্তা "মন"। আভোগের তিনটি কলিতে বিস্তৃত একটি জটিল বাক্য --- এই গানের দীর্ঘতম বাক্য। "মন" তার প্রধান খণ্ডবাক্যের (main clause) কর্তা। এই খণ্ডবাক্যের ক্রিয়ার (ভেবে মরে) অধীনস্থ চারটি আশ্রিত খণ্ডবাক্য (subordinate clause) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কলির দুটি অর্ধাংশে উপস্থাপিত। প্রত্যেকটি খণ্ডবাক্য এক একটি প্রশ্ন। কেন্দ্রস্থিত মনের ব্যাকুল জিজ্ঞাসাই যেন ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে --- তার চিত্ররূপটি হবে এইরকম :

প্রশ্ন প্রশ্ন
↖ ↗
মন
↙ ↘
প্রশ্ন প্রশ্ন

তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে অন্তরায় প্রশ্নবোধক শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে, আভোগে এই প্রয়োগের সংখ্যা চার। প্রথম ক্ষেত্রে একটিমাত্র প্রশ্নবোধক শব্দের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে : কোন্ ..... কোন্। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চারটি স্বতন্ত্র প্রশ্নবোধক শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে : কে, কার, কোন্ কী। অন্তরায় শুধু শুরুতেই প্রশ্ন জেগেছে , প্রথম কলিতেই কেবল প্রশ্নবাক্য। তারপর ব্যক্ত হয়েছে শুধুই মনের আকাঙ্ক্ষা , পরপর দুটি কলিতেই কর্তা মনের অধীন সমাপিকা ক্রিয়া "চায়"। অন্যদিকে আভোগে শুধুই প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আমরা পরপর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

কে এই তরণীর কাণ্ডারী --- প্রথম এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর তিনটি। প্রথম সম্ভাবনা : এই মেঘতরণীর চালক শরৎঋতুর ব্যক্তিরূপ। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

> সম্ভবতঃ নীল আকাশে শুভ্র মেঘের সঞ্চরণ কবিকে এই তরী-বাওয়ার কল্পনায় প্রবৃত্ত করেছে। কাণ্ডারী ঐ শরৎ-সৌন্দর্য, এখানে তার পুরুষ-রূপ। [১৬]

শরৎঋতুর এই পুরুষরূপ কল্পনা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের গানে শরতের নারীরূপটিই প্রতীয়মান হয়। অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর মন্তব্যটি এইক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক :

> শরতের রূপকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষেত্রেই নারীপ্রতিমা ব্যবহার করেছেন। ১৪৪ সংখ্যক গানে শরৎকে শারদলক্ষ্মী সম্বোধন করেছেন। (...) ১৪৬ সংখ্যক গানে শারদলক্ষ্মীর আলোছায়ার আঁচলের কথা আছে।। ১৫১ সংখ্যক গানে দেখি 'তারি সোনার কাঁকন বাজে' 'হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি'। শরৎ-পর্যায়ের শেষ গানটিতে নারী প্রতিমা। [১৭]

এর সঙ্গে আরও উদাহরণ সংযোজন করা যেতে পারে। ১৬৯ নং গানটিতে শরৎকে শারদসুন্দরী সম্বোধন করা হয়েছে। আঁচলের অনুষঙ্গ উপরোক্ত গানটি ছাড়াও দেখা যায় ১৫০ নং গানে (সৌরভ ভরি আঁচলে) ১৫২নং গানে (শরৎ-আলোর আঁচল টুটে) ১৫৭ নং গানে (তোমার ওই আঁচলখানি শিশিরের ছোঁওয়া লেগে), ১৬০ নং গানে (তোমার বুকের খসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা-সে) ১৬৩ নং গানে (ছায়াতে-আলোতে-আঁচল-গাঁথা)। কঙ্কন আছে আরও একটি গানে, ১৫৩ নং গানে (মাণিক-গাঁথা ওই-যে তোমার কঙ্কনে)।ওই গানে আরও আছে ওড়না (ওড়না ওড়ায় একি নাচের ভঙ্গীতে)। অধ্যাপক চক্রবর্তী উল্লিখিত শেষ গানটির প্রতিটি বিশেষণই স্ত্রীলিঙ্গ (কুন্দধবলদলসুশীতলা, সুনির্মলা, সুখসমুজ্জ্বলা, অচঞ্চলা ...) । এই বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই ; আমাদের আলোচনার পক্ষে যা প্রাসঙ্গিক তা হল এই যে যখনই শারদসৌন্দর্যের উপর ব্যক্তিরূপ আরোপ করা হয়েছে তা নারীরূপ --- কখনও পূর্ণ রমণীরূপ, কখনও তার আভাস, কখনও নারী সাজসজ্জার অনুষঙ্গ। শরতের পুরুষরূপ বা তার কোনরকম অনুষঙ্গ আমাদের গানটি বাদ দিলে আর একটি মাত্র গানেই পাওয়া যায়। [১৮]

এই কাণ্ডারী কে তার সম্ভাব্য দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : তিনি বিশ্ববিধাতা, এই ভবের কাণ্ডারী --- ইন্দ্রিয়চেতনায় বিধৃত রূপলোকের অন্তরালে বিরাজমান এক অরূপ সত্তা। শুধু শারদসৌন্দর্যই নয়, ষড়ঋতুর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, নিখিল বিশ্বচরাচরব্যাপী চিরপ্রবহমান রূপমাধুরীধারা তাঁরই অন্তবিহীন লীলার বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ। শারদমেঘের অনুপম শোভা তারই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অভিব্যক্তিমাত্র।

যে তরণীর চালকের স্বরূপবিশ্লেষণের প্রচেষ্টা তাকে আমরা শারদমেঘের সৌন্দর্যের প্রতীক নাও ভাবতে পারি --- যেহেতু গানের কথাবস্তুতে দুইয়ের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয় নি। এই তরণীকে জীবনতরণী বলে ভাবা অযৌক্তিক হবে না। সেক্ষেত্রে অন্বিষ্ট কাণ্ডারী জীবনদেবতা হতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নবাক্যে "ধন" এক ভিন্নতর তাৎপর্য লাভ করেছে। অন্তরায় সুদূরপারের ধন সমগ্র দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তাই ধনবহনের মাধ্যম তরণী সম্পূর্ণভাবেই অন্তরালে চলে গিয়েছিল। ধন আহরণকারী চালককে নিয়ে তখন কোনও প্রশ্ন জাগে নি, এমনকী তার উপস্থিতির সামান্যতম আভাসটুকুও মেলে নি। গানের শেষের শুরু সেই চালকের স্বরূপসন্ধানে। এবার দেখা যাচ্ছে এই ধন আহরণকারী আর ধন একাত্ম হয়ে গেছে, এই ধন অর্জন করতে হলে সাগরের বুকে তরী ভাসাতে হয় না। এই তরীর কাণ্ডারী নিজেই সেই ধন; তার পরম দান সে নিজেই। এবার ধনের উৎস নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই, স্থানবাচক কোন শব্দ নেই। এবার প্রশ্ন ধনের অধিকারীকে নিয়ে এই

কলির দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই একটি ব্যক্তিবাচক প্রশ্নবোধক শব্দ : কার। সেই কাণ্ডারীর স্বরূপ যে উপলব্ধি করতে পারে সেই প্রকৃত ধনী।

এই ধনের প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য এর সঙ্গে যুক্ত সম্বন্ধপদটির বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কাণ্ডারী যদি শরৎঋতু হয় তবে এই হাসিকান্নাকে রৌদ্র ও বৃষ্টির প্রতীক বলে ব্যাখ্যা করা যায়। এমন ভাবনা শরৎ বিষয়ে রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যদি কাণ্ডারী জীবনদেবতা হন তবে হাসিকান্নাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যায়। প্রাথমিক ব্যাখ্যা : শারদশ্রীর পূর্ণ প্রকাশ শুধুই শরৎরবির কিরণে নয়, রৌদ্র ও বর্ষণের সহাবস্থানে। একইভাবে বলা যেতে পারে জীবনদেবতার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় শুধু অবিমিশ্র সুখের মধ্যে নয়, সুখ ও দুঃখের পরিপূর্ণ আস্বাদনের মধ্য দিয়ে। প্রকৃত ধনী সেই যে সমস্ত বিপরীতের মধ্য দিয়ে জীবনের সারাৎসারটুকু গ্রহণ করতে পারে।

এই বিপরীতের প্রয়োগের প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আমরা দেখেছি পূর্ববর্তী অংশেও অনুরূপ প্রয়োগ ঘটেছে। অন্তরায় ছিল অপার ঐশ্বর্যের আকর সমুদ্রপারের দেশ এবং সর্বরিক্ত এই কিনারার বৈপরীত্য, সঞ্চারীতে রৌদ্র ও বৃষ্টির এবং রৌদ্র ও কালোমেঘের বৈপরীত্য। আভোগে কান্নাহাসির বৈপরীত্য। বিপরীতের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেরই রচনাশৈলীগত বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকার গভীরভাবে আলোকপাত করেছেন।

> সুখ-দুঃখ, সুন্দর-কুৎসিত, অন্তর-বাহির, ভয়ঙ্কর-কল্যাণকর, জীবন-মরণ, রূপ-অরূপ, স্থিতি-গতি, নতুন-পুরানো (যৌবন-বার্ধক্য) এইসব বিরোধ-সদস্যদের মধ্যে একটা অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে ইতিবাচক, আমরা তাকে বেশি করে পেতে বা গ্রহণ করতে চাই। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ওই বিরোধী যুগ্মক আমাদের উপলব্ধি বা প্রতিক্রিয়াকেও দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলে। তার মধ্যেও একটা বিরোধ সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথ এই বিরোধকে আমাদের মতো দেখেন না, তিনি দুয়ের মধ্যে একটা গূঢ়তর সংগতি দেখতে পান এবং দুয়ের অন্যোন্য পরিপ্রেক্ষিতটি দেখিয়ে তাদের একটা বৃহত্তর অস্তিত্বের অঙ্গ বলে দেখান--- যেখানে তাঁর কাছে দুই-ই স্বাভাবিক ও সংগত। (...) এই বিরোধগুলি দেখান রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত হল যে, এগুলি আসলে আপাতবিরোধ, অভিজ্ঞতা বা ভাবনার উপরিতলে এগুলিকে পরস্পরের বিপরীত বলে মনে হয়; কিন্তু আসলে কোনো বিরোধ নেই। [১৯]

রবীন্দ্রনাথ বিপ্রতীপের প্রয়োগের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক সরকার এই নিবন্ধে চৌষট্টিটি গানের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে শুধু দুটি গান প্রেম পর্যায়ের, আর দুটি গান বিচিত্র পর্যায়ের ; বাকি ষাটটি গানই পূজা পর্যায়ের। প্রকৃতি পর্যায়ের একটি গানেরও উদাহরণ দেওয়া হয় নি। আমাদের আলোচ্য প্রকৃতি পর্যায়ের এই গানটি আমরা অধ্যাপক সরকারের পূর্বোক্ত বক্তব্যের আলোতে বিশ্লেষণ করতে পারি।

এই গানে বিপ্রতীপের উপস্থাপনের মধ্যে একটা দ্বিস্তরীয় বিবর্তনের রূপরেখা স্পষ্ট। প্রথমতঃ অবস্থানগত বিচারে দেখা যাচ্ছে বিপরীতেরা ক্রমশঃ পরস্পরের আরও কাছাকাছি চলে আসছে। তিনকলিবিশিষ্ট অন্তরার প্রথম ও শেষ কলিতে ওপার ও এপারের অবস্থান : দুইয়ের মধ্যে একটি কলির ব্যবধান। এরপর সঞ্চারীতে পরপর দুটি কলিতে বৃষ্টি ও রৌদ্রের অবস্থান; দ্বিতীয় বা শেষ কলিরই অভ্যন্তরে রৌদ্র ও মেঘের সহাবস্থান। শেষে আভোগের প্রথম কলিতে হাসি ও কান্না একটি সমাসবদ্ধ পদে বাধা পড়ে।

উক্ত বিবর্তনের আর একটি রূপ ধরা পড়ে এই বিপরীতদের ঘিরে অভিব্যক্ত অনুভূতির স্তরে। প্রাথমিক পর্যায়ে দুই বিপরীতের দ্বন্দ্বে স্পষ্টতঃই একটি নির্দিষ্ট পক্ষ অবলম্বন করা হয়েছে। দুইয়ের মধ্যে প্রিয়-অপ্রিয় বা

আকাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিতের শ্রেণিবিভাজন সুস্পষ্ট। অন্তরাতে দেখা যায় "সুদূরের" প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ আর "এই কিনারার" প্রতি গভীর অনাসক্তি।

মধ্যবর্তী পর্যায়ে এই শ্রেণিবিন্যাস তত স্পষ্ট নয় ; দ্ব্যর্থবোধকতার অবকাশ রয়েছে। সঞ্চারী অংশের দুটি ভিন্ন পাঠ সম্ভব। প্রথম পাঠের ভিত্তি আলো-আঁধারের চিরাচরিত প্রতীকী তাৎপর্য। অবসাদ-জাগানো অবিরাম বর্ষণের পর রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের আবির্ভাবকে জীবনের সব নিরানন্দ, সব বিষাদকে বিদায় দিয়ে আনন্দকে আবাহনরূপে ভাবা যেতে পারে। মেঘভারাক্রান্ত আকাশে শরৎরবিকিরণের প্রথম প্রকাশের বর্ণনাকে আলো-আঁধারের দ্বৈরথে আলোর জয় বা অসুন্দরের বিরুদ্ধে সুন্দরের জয়ের বিবরণরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই পাঠ শরৎকে ঘিরে সঞ্চারিত রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে মিলে যায় :

আজি আশ্বিনে স্বচ্ছ বিমল প্রাতে
শুভ্রের পায়ে অম্লান মনে নমো রে।
স্বর্গের রাখী বাঁধো দক্ষিণ হাতে
আঁধারের সাথে আলোকের মহাসমরে।
মেঘবিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস---
'হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হবে রবি, মরিবে মরিবে তম রে।' [২০]

সঞ্চারীর এই পাঠের সঙ্গে পূর্ববর্তী অন্তরা অংশের যোগসূত্রটি সহজেই ধরা পড়ে : পূর্বোক্ত প্রিয়-অপ্রিয় সুন্দর-অসুন্দরের শ্রেণিবিন্যাসের ধারাবাহিকতা এখানে স্পষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রচিন্তাবিশ্বে শরতের এক ভিন্ন রূপও প্রতীয়মান হয় --- যার প্রতিফলন পরের গানটিতে :

শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে---
.....
কালো মেঘের আর কি আছে দিন, ও যে হল সাথিহীন ।
পূব হাওয়া কয়, ' কালোর এবার যাওয়াই ভালো ।'
শরৎ বলে, " মিলিয়ে দেব কালোয় আলো---
সাজবে বাদল আকাশ-মাঝে সোনার সাজে কালিমা ওর মুছে ফেলে।" [২১]

শরতের এমন রূপকল্পনা আমাদের আলোচ্য অংশের দ্বিতীয় পাঠের ভিত্তি। এখানে শরৎ আঁধারের বিরুদ্ধে আলোর বিজয়বার্তা ঘোষণা করে না। তার লক্ষ্য কালো-আলোর যুগলমূর্তি নির্মাণ। এই দুইয়ের মধ্যে কোন শ্রেণিবিভেদ নেই, এই দুইয়ের মিলনেই শারদসৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা।

গানের শেষে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এই দুই বিপরীতের মধ্যে উচ্চ-নীচ, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত সমস্ত শ্রেণিবিন্যাসই অবলুপ্ত হয় গেছে। হাসিকান্নাকে আমরা আক্ষরিক বা প্রতীকী যে অর্থেই গ্রহণ করি না কেন, দেখা যাচ্ছে দুইয়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই, কোন সংঘাত নেই। গ্রহণবর্জন বা জয়পরাজয়ের সমস্ত ধারনা এবার সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যক্ত হয়েছে। একজনকে বিতাড়িত করে বা বিদায় দিয়ে অপরের আবাহন নয়। উভয়েই স্ব স্ব মহিমায় বিরাজিত,

উভয়েই সমান বরণীয়। দুইয়ের মিলনের মধ্যেই লভ্য জীবনের পরম ধন। দুই বিপ্রতীপের মেলবন্ধনের মধ্যেই নিসর্গ তথা মানবজীবনের মহিমার চরম প্রকাশ।

হাসি-কান্না, আলো-আঁধার, সুখ-দুঃখ --- জীবনের সব বিপরীতকে গ্রথিত করে ঐকতান রচনা করতে পারেন শুধুই কবি। কোন কিছুকেই বর্জন না করে জীবনকে তার বিপুলতম বৈচিত্র্যে আস্বাদনের মানসিকতা একান্তভাবে কবির মানসিকতা। খণ্ডচেতনাসম্পন্ন সাধারণ মানুষ অবিমিশ্র সুখের সন্ধানে ছুটে চলে দূরে, সুদূরে। জীবনের পরম সম্পদ রয়েছে পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে বহুদূরে ---এই বিশ্বাস মানবমনের গভীরে প্রোথিত। কিন্তু কবিমন শুধুই সুদূরের উদ্দেশে যাত্রা করে না, এই চিরপরিচিত বাস্তবের তুচ্ছাতিতুচ্ছের মধ্যেও সে তার সৃষ্টির প্রেরণা খুঁজে পায়। বলা চলে সাধারণভাবে মানবমনের এবং নির্দিষ্টভাবে কবিমনের এই দুই প্রবণতা ব্যক্ত হয়েছে অন্তরা ও আভোগে। এই দুই অংশে প্রতিসম অবস্থানে এসেছে যথাক্রমে "মন" ও "মোর মন"। বলা যায় প্রথম ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল মানবমন এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কবিমন। সম্বন্ধপদের (মোর) অনুপস্থিতি ও উপস্থিতি অন্তরা ও আভোগে মনের ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

গানের সমাপ্তি ঘটে সুরের অন্বেষণে। জীবনের বিপরীতের যে মিলনের কথা বলা হল তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল সুর। সুরের মায়াজালে সমস্ত শ্রেণিবিভাজনরেখা বিলুপ্ত হয়ে যায়, সুরের বাঁধনে বাধা পড়ে হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, জীবন-মৃত্যু। বিশেষভাবে উল্লেখ্য গীতবিতানের প্রথম গানের প্রথম কথাই হল "কান্নাহাসি"।

কান্নাহাসির-দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা--- [২২]

শুধু হাসি দিয়ে গানের ডালি সাজানো সম্পূর্ণ হয় না, কান্নাও সমান অপরিহার্য। আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রিত কবি প্রাণের গানের সুর বাঁধেন হাসি ও কান্না দিয়ে :

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
.....
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি---
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের **কান্না হাসি।** [২৩]

আপন প্রাণের গভীরেও কবি শুনতে চান কান্নাহাসির সুরটি :

আমি কান পেতে রই ও আমার আপন হৃদয়গহন-দ্বারে বারে বারে
কোন্ গোপনবাসীর **কান্নাহাসির** গোপন কথা শুনিবারে--- বারে বারে।। [২৪]

আর উদাহরণ বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। গানের এই শেষ কলির শুরু সুর বাঁধার প্রস্তুতিতে। অবশেষে আসে গাওয়ার পালা। তরণীর সঙ্গে গানের অনুষঙ্গ একাধিক গানে দেখা যায়।

কূল থেকে মোর **গানের তরী** দিলেম খুলে
সাগর-মাঝে ভাসিয়ে দিলেম পালটি তুলে।। [২৫]

খেলার ছলে ভাসিয়ে আমার **গানের বাণী**
দিনে দিনে ভাসাই দিনের **তরীখানি** । [২৬]

গান আবার পারানির কড়ি হতে পারে, কাণ্ডারীকে গান গেয়ে ভোলানোর ভরসা রাখেন কবি।

কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি---

.....

আমার সুরের রসিক নেয়ে

তারে ভোলাব গান গেয়ে,

পারের খেয়ায় সেই ভরসায় চড়ি।। [২৭]

গানের সঙ্গে তরণীর অনুষঙ্গের উদাহরণ আর বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। আমদের এই আলোচনায় যা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক তা হল এই যে এই তরণীতে গান গাওয়া হয় না, গাওয়া হয় মন্ত্র। এই তরণীটি সাধারণ কোন তরণী নয় ; গানের শুরুতেই আমরা দেখেছি তার অমল ধবল পালটি। আমরা আগেই বলেছি এমন বিশেষণের প্রয়োগে এই তরী এক মহিমান্বিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর অনুপম শোভা অতীতে দৃষ্ট সমতুল সব দৃশ্যকেই ছাপিয়ে গেছে। অদৃষ্টপূর্ব, অনন্যসাধারণ এমন তরীতে গান গাওয়া যায় না, গাইতে হয় মন্ত্র।

কাণ্ডারী কে --- এই প্রশ্ন আমাদের আলোচ্য গানটি ছাড়া আরও দুটি গানে উচ্চারিত হয়েছে।

তুমি এ-পার ও-পার কর কে গো ওগো খেয়ার নেয়ে ? [২৮]

মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে।

লাগল পালে নেশার হাওয়া, পাগল পরাণ চলে গেয়ে।। [২৯]

কাণ্ডারী বা নেয়ে কে এই প্রশ্ন নিয়েই আমাদের আলোচ্য গানের সমাপ্তি ঘটেছে কিন্তু ওই প্রশ্ন দিয়ে উপরোক্ত অন্য গান দুটি শুরু হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রশ্ন রাখা হয়েছে শুধুমাত্র গানের প্রথম কলিতে ; কোথাও আর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা হয় নি। ওই দুটি গানের মধ্যে প্রথমটিতে দ্বিতীয় কলি থেকে কবি যা দেখেন তারই বিবরণ দেন। দুইবার তিনি তার মনের বাসনা ব্যক্ত করেন : "আমি তখন মনে ভাবি আমিও যাই ধেয়ে (চতুর্থ ও চতুর্দশ কলি)।দ্বিতীয় গানটিতে দ্বিতীয় কলির পর থেকে একটি ক্রিয়াবিহীন বাক্য বাদ দিলে প্রতিটি বাক্যই অনুজ্ঞাবাক্য ; এই সাতটি কলিতে পাঁচটি অনুজ্ঞাবাক্য । নেয়ের উদ্দেশে তিনি তার প্রার্থনা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ দুটি গানেই কাণ্ডারী বা নেয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গানে প্রশ্নের পরে শুধুই প্রশ্নই আসে।

"কে তুমি" রবীন্দ্রভাবনাজগতে এই প্রশ্নের উত্তর বোধহয় মেলে না। কবির জীবনের অন্তিম লগ্নে রচিত এই কবিতাটি এইক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

প্রথম দিনের সূর্য

প্রশ্ন করেছিল

সত্তার নূতন আবির্ভাবে---

কে তুমি ।

মেলে নি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেলে,

দিবসের শেষ সূর্য

শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে

নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়---

কে তুমি।

পেল না উত্তর।। [৩০]

"কে তুমি" এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের আলোচ্য গানেও মেলে নি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন --- উত্তরে থাকে শুধুই নীরবতা। যে গানের শুরু হয়েছিল গভীর মুগ্ধতায়, অধীর প্রশ্নব্যাকুলতায় তার সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান,কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,২০১৩, পৃ ৪৯৮

২) তদেব : পৃ ৪৮২

৩) তদেব : পৃ ৪৮৩

৪) তদেব : পৃ ৪৫৫

৫) চক্রবর্তী, জগন্নাথ : গীতাঞ্জলি অস্তিত্ব বিরহ পৃ ২৫

৬) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, রবীন্দ্ররচনাবলী, নবম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,১৯৯৫,পৃ ২৭৩

৭) ব্যতিক্রম শরৎ উপপর্যায়ের একটিমাত্র গান। এই গানটিতে সাত ভাই চম্পার কাহিনির অনুষঙ্গ রয়েছে :

আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি, তাই ভোরে উঠেছি।

.....

আজ **পারুলদিদির বনে** মোরা চলব নিমন্ত্রণে,

চাঁপা-ভায়ের শাখা-ছায়ের তলে মোরা সবাই জুটেছি।

(গীতবিতান /প্রকৃতি/১৪৯)

৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, রবীন্দ্ররচনাবলী, নবম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,১৯৯৫,পৃ ২৭৩

৯) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান,কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,২০১৩, পৃ ৪৮৭

১০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান,কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,২০১৩, পৃ ৪৮২

১১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, রবীন্দ্ররচনাবলী, নবম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,১৯৯৫,পৃ ২৭৫

১২)ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান,কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,২০১৩, পৃ ৪৮৭

১৩) তদেব : পৃ ৪৮৮

১৪) তদেব : পৃ ৪৮৭

১৫) তদেব : পৃ ৪৭৩

১৬) দাস, ক্ষুদিরাম : চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী, কলিকাতা, গ্রন্থনিলয়, বঙ্গাব্দ ১৩৭৩, পৃ ১৫০

১৭) চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার : রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা : কথা ও সুর,কলকাতা, জিজ্ঞাসা,১৯৮৩, পৃ ১৮০

১৮) এই গানে ব্যবহৃত বিশেষণগুলির কারণে বলা যেতে পারে শরতের চিত্রিত রূপটি পুরুষরূপ।

নির্মল কান্ত নমো হে নমো, নমো হে, নমো হে।

স্নিগ্ধ সুশান্ত, নমো হে নমো, নমো হে, নমো হে ।

(গীতবিতান /প্রকৃতি /১৬৬)

১৯)সরকার, পবিত্র : দ্বন্দ্ববিরোধ : রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক সৃজনভিত্তি, গানের ঝরনাতলায়, কলকাতা, প্রতিভাস,২০১৩, পৃ ১২৭-১২৮

২০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, রবীন্দ্ররচনাবলী, নবম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,১৯৯৫,পৃ ২৭৪

২১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান,কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,২০১৩, পৃ ৪৬২
২২) তদেব : পৃ ২
২৩) তদেব : পৃ ১৩৩
২৪) তদেব : পৃ ২১৫
২৫) তদেব : পৃ ১২
২৬) তদেব : পৃ ১৬
২৭) তদেব : পৃ ১৭
২৮) তদেব : পৃ ৬৮
২৯) তদেব : পৃ ৩২১
৩০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : শেষ লেখা, ১৩, রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,১৯৯৫,পৃ ১২৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

খাতুন, সনজীদা : রবীন্দ্রসঙ্গীত মননে লালনে, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১
মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার : গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী, টেগোর রিসার্চ ইনশষ্টিটিউট, ২০০৩
রায়, আলপনা (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রনাথের গান অনুষঙ্গ , কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০১
রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী,১৯৮০
সেন, সুকুমার : রবীন্দ্রনাথের গান, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনশষ্টিটিউট, ১৯৮২